মুসলিমদের মাঝে পারস্পারিক মতবিরোধ!

(কী,কেন,তাঁর উদ্দেশ্য ও ফলাফলের আলোচনা)

মূল–লেখক
ড. তারিক আব্দুল হালিম

অনুবাদক:
উস্তাদ আহমাদুল্লাহ মূসা

মুসলমানদের মাঝে পারস্পারিক মতবিরোধ!

[কী, কেন, তাঁর উদ্দেশ্য, ও ফলাফলের আলোচনা]

মূল -লেখক

ড. তারিক আব্দুল হালিম

অনুবাদক:

উস্তাদ আহমাদুল্লাহ মূসা

প্রথম অধ্যায়

(১)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد

আলহামদুলিল্লাহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহী আজমাঈন আম্মা বাদ: হামদ ও সালাতের পর কথা হল,

আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করি হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সোজা পথ দেখাও, জীবনের প্রত্যেকটি শাখা প্রশাখায় এবং প্রত্যেকটি বিভাগে, চিন্তা, কর্ম ও আচরণের এমন বিধি-ব্যবস্থা আমাদের শেখাও, যা হবে একেবারেই নির্ভুল!

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের এমন পথ দেখাও। যা পারস্পারিক মতবিরোধের গোলকধাঁধার মধ্য থেকে যথার্থ সত্যকে উন্মুক্ত করে আমাদের সামনে তুলে ধরে। বিভিন্ন নৈতিক চিন্তা-দর্শনের মধ্য থেকে যথার্থ ও নির্ভুল নৈতিক চিন্তা-দর্শন আমাদের সামনে উপস্থাপিত করে।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জীবনের অসংখ্য পথের মধ্য থেকে চিন্তা ও কর্মের, সরল ও সুস্পষ্ট রাজপথটি আমাদের দেখাও।

কেননা ইসলামের দাবিদাররা শাখাগত মাসয়ালা মাসায়েলে এমন মতানৈক্য আর মতবিরোধ সৃষ্টি করছে।

যা মুসলিমদের অনেক পেরেশানির কারণ হয়। তাই প্রত্যেক যুগের আলেমগণ সে সকল সন্দেহ দূর করার জন্য এবং উম্মাতকে ঐ নিন্দনীয় মতানৈক্য থেকে রক্ষা করার জন্য মুসলিমদের মাঝে মতানৈক্যের কারণ বলে দিয়েছেন। আবার কখনো স্বতন্ত্র কিতাবও লিখেছেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়,

পূর্বসূরি অনেক মুহাদ্দিসীন ও বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম মুসলমানদের মাঝে পারস্পারিক মতবিরোধ ও মতানৈক্য বিষয়ে বহু কিতাব লিখেছেন। সুতরাং এ বিষয়টি পূর্ব থেকেই বহুল আলোচিত, এমন নয় আমরা নতুন করে এ বিষয়টি সাজিয়েছি।

মতানৈক্য বিষয়ে যিনি প্রথম কলম ধরেছেন তিনি হলেন, ইমাম যায়েদ আদ দাবুসী আল হানাফি রহ.। তিনি তার কিতাবের নামকরণ করেছেন «تأسيس النظر» (তা 'সীসুন নজর)।

তিনি এই কিতাবে হানাফি উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে মতানৈক্যপূর্ণ মৌলিক মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন যেগুলো শরীয়তের শাখাগত মাসয়ালায় মতানৈক্য তৈরি করে।

তিনি তার কিতাবকে আট অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রত্যেক অধ্যায়ে তিনি ঐসকল বিষয় তুলে ধরেছেন যেগুলোতে কতক ইমাম কতক ইমামের সাথে মতানৈক্য করেছেন। এবিষয়ে আরও কিছু ছোট কিতাব পূর্বে রচিত হয়েছিল। তবে মৌলিক মূলনীতি উল্লেখ্য করে বিস্তৃতভাবে শাখাগত বিরোধপূর্ণ মাসয়ালার বিবরণ দিয়েছেন আদ দাবুসী রহ.। এমনিভাবে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এমন একজন বিখ্যাত ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন যিনি আল ইখতিলাফ নামক কিতাব রচনা করেছেন। সেই সম্মানিত ব্যক্তি হলেন ইমাম আহমাদ রহ.।
পরে তা السعة নামে নামকরণ করা হয়েছে।
এমনিভাবে, ইখতিলাফ বিষয়ে গুরুপূর্ণ কিতাব-
«الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الإختلاف»
রচনা করেছেন ইমাম ইবনে সায়্যেদ রহ.।
এমনকি উলামায়ে কেরাম উসুল শাস্ত্রে তাদের আলোচনার মাঝে ইজতিহাদ ও ইখতিলাফ, তাকলিদের ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন।
যেমনিভাবে, শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া রহ. তার রচিত মাজমুয়ুল ফতওয়াতে মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ইখতিলাফ বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করে তিনি পৃথক আরেকটি কিতাব লিখেছেন।
যার নাম রেখেছেন- «رفع الملام عن الإئمة الأعلام» যা অনেক প্রসিদ্ধ এবং সহজলভ্য।
এমনিভাবে, কাজী ইবনে রুশদ রহ, "বিদায়েতুল মুজতাহিদ" নামক কিতাবে মতানৈক্যের কারণ বর্ণনা করেছেন। আর আমাদের হিন্দুস্তানের বিখ্যাত মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রহ. তার রচিত যুগান্তকারী কিতাব « حجة الله البالغة» হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগায় ইখতিলাফ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এরপর তিনি এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র কিতাবও লিখেছেন।
যুগে যুগে অনেক মুহাদ্দিস এব্যাপারে কিতাব লিখেছেন।– সেই সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের কিছু নাম তুলে ধরা হল:

১. ড. আব্দুল কারীম যাইদান রহ. এর রচিত কিতাব-
«الإختلاف في الشريعة الإسلامية»،

২. শায়খুল ইসলাম আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক তার রচিত কিতাব -
«القواعد الذهبية في فقه الخلاف

৩.ড. সাইয়্যেদ মুস্তফা আল খান্নী রহ. এর রচিত কিতাব-
«أثر الإختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء»
সম্মানিত লেখকগণ তাদের যুগের চাহিদা অনুযায়ী ইখতিলাফ বিষয়ে কিতাব রচনা করেছেন।

সুতরাং আমরাও চেষ্টা করব বর্তমান সময়ের উপযোগী করে, মুসলিম উম্মাহের মাঝে চলমান মতবিরোধের কারণ তুলে ধরার। যেন বর্তমান মুসলিম প্রজন্ম বাস্তবতার আলোকে মতানৈক্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারে। বিইযলিল্লাহ...

(২)

এটাতো সকলেরই জানা কথা যে, কুরআন নাযিলই করা হয়েছে, মতানৈক্য দূর করার জন্য।

একাধিক বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোকে মূলনীতির আলোকে নির্ধারণ করতে।

যেমনটি আল্লাহ তায়ালা কুরআনে নাযিল করেছেন,

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ»آل عمران 105»

আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বিভক্ত হয়েছে এবং মতবিরোধ করেছে তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর। আর তাদের জন্যেই রয়েছে কঠোর আযাব।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনের অন্যত্র বলেছেন,

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ » النحل 124»

শনিবার পালনতো শুধু তাদের জন্যই বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল যারা এ বিষয়ে মতভেদ করেছে। তারা যে বিষয়ে মতভেদ করেছে নিশ্চয় তোমার রব সে বিষয়ে ফায়সালা করে দিবেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

«وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا»

البقرة 253

আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর পয়গম্বরদের পেছনে যারা ছিল তারা লড়াই করতো না। কিন্তু তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের কেউ তো ঈমান এনেছে, আর কেউ হয়েছে কাফের। আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা পরস্পর লড়াই করতো, কিন্তু আল্লাহ তাই করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন। (সূরা বাকারা ২৫৩)

এমনিভাবে, আল্লাহ তায়ালা হযরত শোয়াইব আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করে বলেছেন,

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ» هود 88»

আর আমি চাই না যে তোমাদেরকে যা ছাড়াতে চাই পরে নিজেই সে কাজে লিপ্ত হব, আমি তো যথাসাধ্য শোধরাতে চাই। সূরা হুদ-৮৮

উপরে উল্লেখিত আয়াতগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে উসূলবিদ ও অধিকাংশ ফকিহগণের মতামত হল – খিলাফ এবং ইখতিলাফ সমার্থবোধক শব্দ। তবে আয়াতগুলোতে গভীরভাবে মনোযোগ দিলে

একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য বুঝে আসে।

আরবি অভিধান মোতাবেক-

خالف /خالفَ عن يُخالف ، خِلافًا ومُخالفةً ، فهو مُخالِف ، والمفعول مُخالَف – للمتعدِّي،

অর্থাৎ- দুই জিনিসের মধ্যে মতবিরোধ হওয়া। একটি আরেকটির বিরোধ হওয়া। একটি আরেকটির ভিন্ন ভিন্ন হওয়া।ভিন্নমত পোষণ করা।

اخْتَلَفَ الشيئان : لم يَتَّفِقا. سواء تضادا أم لا

আর দুটি জিনিসের মাঝে ইখতিলাফ হল- একটি আরেকটির অনুযায়ী না হওয়া। চাই একটি আরেকটির বিপরীত হোক বা না হোক।

উপরের শব্দ বিশ্লেষণে একটি পার্থক্য প্রকাশ পেয়েছে যে, ইখতিলাফটি খেলাফ থেকেও আরও ব্যাপক।

فالاختلاف كلّ ما غاير المقابل، سواء بمضادة أو لا

সুতরাং একটি আরেকটির মত না হলেই তাকে ইখতিলাফ বলা হবে। চাই একটি আরেকটির বিপরীত হোক বা না হোক।

আর খেলাফ বলা হবে তাকেই যা একটি আরেকটির বিপরীত হবে।

উদাহরণস্বরূপ: বিখ্যাত ব্যক্তি ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বাণী, «اختلاف التنوع واختلاف التضاد»

এমটাও হওয়া সম্ভব যখন তাখসিসের ইচ্ছা করা হয়-«اختلاف التنوع وخلاف التضاد»

কিন্তু তার ব্যাখ্যা হল-ব্যাপক ভাবে উল্লেখ করলে খেলাফ ও ইখতিলাফ উভটিকেই শামিল করবে। তবে ইখতিলাফটি খেলাফকেও শামিল করে কিন্তু খেলাফটি ইখতিলাফকে শামিল করে না বিধায় প্রথমটি দ্বিতীয়টি থেকে ব্যাপক।

আর যেহেতু শরিয়ত এসেছেই মতানৈক্য দূর করে মূলনীতি বর্ণনা করতে।

যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

.وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا»

তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না? যদি এটি আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষ থেকে হতো, তাহলে তারা এর মধ্যে বহু বর্ণনাগত অসঙ্গতি খুঁজে পেতো।(৪-সুরা নিসা:৮২.)

এটাই মূল উসূল।যেমনটি আশ শাবী রহ. বলেছেন,

"الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف كما أنها في أصولها كذلك ولا يصلح فيها غير ذلك

সমগ্র শরিয়াতের শাখাগত মাসয়ালার মূল বিষয় একটি মূলনীতিতে গিয়ে পৌঁছবে। যদিও তার শাখাগত মাসয়ালায় অনেক মতবিরোধ রয়েছে। সুতরাং তার মূলনীতিতে যা রয়েছে তা ব্যতীত মতভেদ দূর করা সম্ভব নয়।

(৩)

ইমামদের মাঝে ইখতিলাফ সংঘটিত হয়েছে শরয়ী দলীলের কারণেই। যেমনিভাবে উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার শরিয়তে ইখতিলাফ সংঘটিত হয়েছে। যেমন - আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

.وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ »هود «

অবশ্যই তোমার রব চাইলে সমগ্র মানবজাতিকে একই গোষ্ঠীভুক্ত করতে পারতেন, কিন্তু এখন তারা বিভিন্ন পথেই চলতে থাকবে। এবং বিপথে যাওয়া থেকে একমাত্র তারাই বাঁচবে যাদের ওপর তোমার রব অনুগ্রহ করেন। (১১-সুরা হুদ:১১৮.)

তিবরানী রহ. মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন,

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ- তারা বিভিন্ন পথেই চলতে থাকবে। তারা হল আহলে বাতেল তথা পথভ্রষ্ট।

إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ- এবং বিপথে যাওয়া থেকে একমাত্র তারাই বাঁচবে যাদের ওপর তোমার রব অনুগ্রহ করেন। তারা হল আহলে হক্ব তথা হেদায়েতের অনুসারী।

আর ইবনে কাসীর রহ. কাতাদাহ রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, কাতাদাহ রহ.বলেছেন,-

إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ-হলেন আহলে জামা'আহ। যদিও তাদের স্থান- কাল- পাত্র-ভেদে ভিন্ন হয়।

আর আহলে মা'সিআহ তথা পথভ্রষ্ট হল আহলে ফিরকাহ। যদিও তাদের বসবাস ও অবস্থান এক স্থানে হয়। যেমন পূর্বের উম্মাতের মাঝে লূত (আঃ) এর সম্প্রদায় এবং সালেহ ও হযরত শোয়াইব এর সম্প্রদায়সহ অন্যান্য যাদের ঘটনা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া খ্রিস্টান জাতি, ইহুদী, হিন্দু, বৌদ্ধসহ আরও বিভিন্ন বাতিল ধর্ম সৃষ্টি হওয়াও মতানৈক্য হওয়ার প্রমাণ। সেই ইখতিলাফের মূলনীতির উপর ভিত্তি করেই প্রত্যেকটি বাতিল ধর্ম টিকে আছে। মৌলিক কিছু মূলনীতি যেমন: মহান পরাক্রমশালী খালেকের (সৃষ্টিকর্তার) উপলব্ধি, ধারণা ও বিশ্বাস।

তার সাথে মাখলুকের (সৃজনকৃতের) সম্পর্ক। দুনিয়াতে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব, তার মৃত্যুর পর সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন। এই বিষয়গুলোর মাঝে ইখতিলাফ হওয়ার কারণে বাতিল ধর্মগুলোর মাঝেও ব্যাপক মতানৈক্য তৈরি হয়েছে।

আর সহিহ হাদিসে এসেছে, আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ ইয়াহূদীরা একাত্তর বা বাহাত্তর ফিরকায় (দলে) বিভক্ত হয়েছে ; নাসারারাও একাত্তর বা বাহাত্তর দলে বিভক্ত, আর আমার উম্মাত তিয়াত্তর ফিরকায় বিভক্ত হবে ।

আর আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি: থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন: বনু ইসরাঈলের যে অবস্থা এসেছিল আমার উম্মতরাও ঠিক তাদেরই অবস্থায় পতিত হবে। এমনকি তাদের কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে থাকে তবে আমার উম্মতেরও কেউ তাতে লিপ্ত হবে। বনূ ইসরাঈলরা তো বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে আর আমার উম্মতরা বিভক্ত হবে তিহাত্তর দলে। এদের একটি দল ছাড়া সব দলই হবে জাহান্নামী।

সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! এরা কোন দল?

তিনি বললেন: আমি এবং আমার সাহাবীরা যার উপর প্রতিষ্ঠিত।

আরও কিছু রেওয়ায়েতে আছে, সেটি হল আল জামাআহ।

হাদিসটি ইমাম আবু দাউদ, আত্ তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আল হাকেম রহ. বর্ণনা করেছেন। এ হাদিসকে ইমাম মুসলিম রহ. এর শর্ত অনুযায়ী সহিহ বলা হয়েছে।

উপরের আলোচনায় যে মতানৈক্য, ইখতিলাফের কথা ইশারা করা হয়েছে সেগুলো ছিল ধর্ম কেন্দ্রীক। কখনো ইখতিলাফ দ্বীনের ভিতরেও প্রবেশ করে। যেমন আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত (আহলে হক্ব) বনাম আহলে বাতেল, আহলে বেদয়াত, আহলে আহওয়াহ তথা খায়েশাতের পূজারী।

হযরত শাতিবী রহ,. তার আল ই'তিসামে বলেছেন, উল্লেখিত দুটি মতাদর্শের মাঝে প্রথমটিতে নিম্মস্থরের মধ্যস্থতা এবং দ্বিতীয়টিতে উচ্চস্তরের মধ্যস্থতা। সেটি হল মৌলিক দ্বীনের ক্ষেত্রে সকলেই একমত। মতানৈক্য হয়েছে কিছু মূলনীতিকে কেন্দ্র করে। যা ফেরকাগত পৃথকতাকে আবশ্যক করে। ফলে ইফতিলাফের বিষয়টি এমন হয়েছে, যা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)

এর উম্মাহ সম্পর্কে করা ভবিষ্যৎ বাণী বাস্তবে রুপ নিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন: আমার উম্মাত তিয়াত্তর ফিরকায় বিভক্ত হবে ।

তিনি আরো সংবাদ দিয়েছেন, এই উম্মাহ পূর্বের জাতির রীতিনীতি পুরাপুরি অনুসরণ করবে। এমনকি তাদের কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে থাকে তবে আমার উম্মতেরও কেউ তাতে লিপ্ত হবে।

সুতরাং আমাদের পূর্বের জাতিদের ইখতিলাফও এই উম্মাতের মাঝে সংঘটিত হবে। যাদের মাঝে ঐ বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে তারাই পথভ্রষ্ট আহলে বিদআহ। তারা এই অবস্থায় মারা গেলে তাদের অবস্থান হবে জাহান্নাম। তারা আল্লাহ তায়ালার সকল ধরণের দয়া, করুণা, রহমত থেকে বঞ্চিত হবে।

তবে শরিয়তের শাখাগত মাসয়ালা মাসায়েলের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ মুজতাহিদ আলেমগণের মাঝে শরয়ী দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে যে ইখতিলাফ তথা মতানৈক্য মতপার্থক্য হয়েছে, সেগুলো নিন্দনীয় নয়। ইখতিলাফকে নিন্দা করে কুরআন ও হাদিসে যে ধমকি বর্ণিত হয়েছে তা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। তার বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

(৪)

শরিয়াতের শাখাগত মাসয়ালা মাসায়েলের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ মুজতাহিদগণ ও মুফতীগণের মাঝে মৌলিক দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে ইখতিলাফ হয়ে থাকে।

1.শরিয়াতের হুকুমের মাঝে পার্থক্যের কারণে।

2. হুকুমের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পার্থক্যের কারণে।

আমরা দ্বিমতের এই দুই অংশের আলোচনা শুরু করার পূর্বে, এ দুইটির সাথে সম্পৃক্ত কিছু বিয়য় এবং এ দু ধরণের ইখতিলাফের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করতে চাই।

আর তা হল: ইখতিলাফটি গ্রহণীয় হবে অথবা অগ্রহণীয় হবে।

•গ্রহণযোগ্য ইখতিলাফের বৈশিষ্ট্য

ইখতিলাফটি পরস্পর মুজতাহিদগনের মাঝে হবে। মুজতাহিদ ও সাধারণ মানুষের মাঝে নয়।

কিংবা শুধু সাধারণ মানুষের মাঝেও নয়।

উসূলের কিতাব সমূহে শরিয়তে গ্রহণযোগ্য মুজতাহিদের পরিচয় নিয়ে কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

মুজতাহিদ কাকে বলা হবে!

১.মুজতাহিদ বলা হবে এমন একজন একনিষ্ঠ ও কুরআন হাদিসে বিজ্ঞ ব্যক্তি যিনি কোন একটি বিষয়ে প্রাপ্ত সব উৎস, তথ্য, উপাত্ত, পরিসংখ্যান যাচাই এবং গবেষণা করে নিশ্চিত হন যে তিনি ঐ ব্যাপারে জানার জন্য তার সাধ্যানুযায়ী সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করেছেন।

এজন্য মুজতাহিদের পক্ষ থেকে তার নিজের প্রচেষ্টার সবটুকু উজাড় করে দেয়ার পরই তার মতকে যৌক্তিকভাবে নির্ভরযোগ্য ভাবা চলে।

২. যিনি আরবী ভাষার শাব্দিক ও ব্যবহারিক, পারিভাষিক, বাক্যের উদ্দেশ্য, কোন একটি বিষয়ের দলীল প্রমাণাদিকে হাকিকত ও মাজায সহকারে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন তাকেই মুজতাহিদ বলা হবে।

উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলোর সাথে সাথে ইজমার আলোচ্য বিষয়, নাসেখ মানসুখ সম্পর্কেও বিজ্ঞ হতে হবে।

এজন্যই একজন মুজতাহিদের জন্য ইলমের সকল বিষয়ের জ্ঞান থাকা আবশ্যক কী না? এটি একটি জটিল প্রশ্ন!

যে হাফিজে হাদিসের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারীর মত, ইলমে বালাগাতের ক্ষেত্রে ইমাম খলীল রহ,এর মত।

ইলমে উসূলের ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী রহ, এর মত। ইলমে সিরাতের ক্ষেত্রে ইবনে হিশাম রহ. এর মত।

ইলমে ফারায়েযের ক্ষেত্রে আলী রাযি. এর মত। সবগুলো কী এক সাথে অর্জন করা সম্ভব?

উত্তর হবে না। এটা পাওয়া যাওয়া আবশ্যক নয়। কেননা এটা যদি ধরেও নেওয়া হয় তবু প্রায় অসম্ভব।

আশ শাতিবী রহ. বলেছেন, একজন মুজতাহিদের জন্য শরিয়াতের আহকামের সাথে সম্পৃক্ত ইলমের সকল বিষয়ের মুজতাহিদ হওয়া সম্ভব নয়। বরং এটি কয়েক ভাগে বিভক্ত, সকল ক্ষেত্রে সমান দক্ষতা হাসিল করা তার জন্য আবশ্যক নয়। বরং তার জন্য আবশ্যক হল যে বিষয়ে ইজতিহাদ করবে সে বিষয়ে পরিপূর্ণ দক্ষ হওয়া আর অন্য সকল বিষয়ে অন্যান্য মুজতাহিদ ব্যক্তিদের তাকলিদ করা। সুতরাং প্রকৃত ইজতিহাদের ক্ষেত্রেও তাকলিদ করা থেকে খালি হবে না।

আল মুয়াফিক্বাত খন্ড ৪ পৃ.১০৯

আর ইমাম শাতিবী রহ. যা বলেছেন ইমাম গাযালী রহ. তার তার সাথে আরো দুটি বিষয় যোগ করেছেন।

১. আদালত তথা ন্যায়পরায়ন হওয়া
২. হাদিস শাস্ত্রে মুজতাহিদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ দক্ষতা হাসিল করা।

তিনি বলেছেন, এ দুটি বিষয় তিনটি শাস্ত্রকে আবশ্যক করে।
যথা: ১. ইলমুল হাদিস ২. ইলমুল লোগাত ৩. ইলমু উসূলুল ফিক্বহী

এমনিভাবে, শাতেবী এবং গাজালি রহ. মৌলিক আরবী ভাষা সম্পর্কে জানাকেও জোড় দিয়েছেন।

তবে তা ইমাম খলীল রহ. এর মত দক্ষতা উদ্দেশ্য নয়। বরং এ বিষয়ে এমন হতে হবে যেন আরবী ভাষার মাফহুম বুঝতে পারে। রাসূল (ﷺ) এর জামানায় আরবী বাক্যের যা উদ্দেশ্য ছিল হুবহু সে ভাবেই বুঝতে পারা। সুতরাং নি:সন্দেহে বলা যায়, মুজতাহিদ হওয়ার জন্য গভীর ইলমের প্রয়োজন। যা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। ইমাম গাযালী রহ. আরো একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন, আরবী ভাষার উদ্দেশ্য বুঝা যার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। এমনিভাবে আরবী বাক্য থেকে কোনটি আম (সাধারণ), খাস (বিশেষ), মুতলাক্ব (শর্তহীন), মুকায়্যাদ (শর্তযুক্ত), মুজমাল (অ-ব্যাখ্যাত), মুবায়্যান (ব্যাখ্যাত) পার্থক্য করার যোগ্যতা থাকা। তবে তা ইমাম খলীল রহ. কিংবা মুবার্রাদ রহ. এর মত বিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক নয়।
বরং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ সম্পর্কে এই পরিমাণ জ্ঞান খাকতে হবে যেন, কুরআন হাদিসের আহকাম নির্ণয় করতে পারেন।
এজন্যই আমরা বলি প্রয়োজনীয় পরিমাণ ইলমে উসূল সম্পর্কে জানতে হবে। শরিয়তের উদ্দ্যেশিত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত জ্ঞান থাকতে হবে যা তাকে স্থান কাল পাত্র ভেদে ফতোয়ার ভিন্নতার ক্ষেত্রে ভুল ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করবে।

আর শাইখ মুহাম্মদ বিন উছাইমীন (রহ.) বলেন:

•ইজতিহাদের কিছু শর্ত আছে। যথা:
•ইজতিহাদ করার জন্য যে দলিলগুলো জানা প্রয়োজন সেগুলো জানা থাকা। যেমন- আহকাম(হুকুম) সংক্রান্ত আয়াতগুলো ও হাদিসগুলো।
•হাদিস সহিহ ও দুর্বল হওয়া সংক্রান্ত জ্ঞান জানা থাকা। যেমন- হাদিসের সনদ ও রাবীদের পরিচয় ইত্যাদি।
•নাসেখ (রহিতকারী), মানসুখ (রহিত) ও ইজমা (ঐক্যমত) সংঘটিত হওয়া বিষয়গুলো জানা থাকা। যাতে করে, কোনো কিছুকে মানসুখ বলে হুকুম না দেয় কিংবা ইজমা বিরোধী কোনো হুকুম না দেয়।

•যে দলিলগুলোর কারণে হুকুম পাল্টে যেতে পারে যেমন- তাখসিস (সীমাবদ্ধকরণ), তাকয়িদ (শর্তযুক্ত করণ) ইত্যাদি দলিলগুলো জানা থাকা। যাতে করে এগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক কোনো হুকুম না দেয়।
•শব্দের অর্থ নির্ণয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আরবী ভাষা ও উসুলুল ফিকহ এর যে জ্ঞানগুলো রয়েছে সেগুলো জানা থাকা। যেমন- আম (সাধারণ), খাস (বিশেষ), মুতলাক্ব (শর্তহীন), মুকায়্যাদ (শর্তযুক্ত), মুজমাল (অ-ব্যাখ্যাত), মুবায়্যান (ব্যাখ্যাত) ইত্যাদি। যাতে করে শব্দের অর্থগত নির্দেশনার দাবী মোতাবেক হুকুম দিতে পারেন।

মোট কথা, এমন যোগ্যতা থাকা যে যোগ্যতা দিয়ে তিনি দলিল থেকে হুকুম নির্ণয় করতে পারেন।" আর যেহেতু শরয়ী নুসূসসমূহ আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর শরয়ী হুকুমসমূহ এই নুসূস থেকেই বের করা হয়েছে। এজন্য এটা পরিষ্কার বিষয় যে, আরবী ভাষায় এই পরিমাণ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, যাতে করে শরয়ী চেতনাকে খুব ভালোভাবে এবং সার্বিকভাবে অনুধাবন করা যায়। অর্থাৎ খেতাবের মধ্যে শব্দসমূহের আভিধানিক অর্থ, কথার ধরণ, নাহু এবং সরফ এর কায়দাসমূহ, খাস ও আম, মতলক ও মুকাইয়াদ, বয়ান ও মুবাইয়ান, মুজমাল ও তাফসীল, হাকীকত ও মাজায, আমর ও নাহী, নাসেখ ও মানসুখ, হুরুফ ও আলফাজের প্রকারসমূহ, আজনাসে কালাম, দালালতে আলফাজ ইত্যাদি।

পাশাপাশি, দলীল-প্রমাণাদি, শরয়ী হুকুম এবং তার প্রকারভেদ, কিয়াস ও ইল্লত, তারজীহ এর প্রকার, জরাহ এবং তা'দীলের ইলম, আসবাবে নুযূল, সুন্নাহ্ এবং তার প্রকারসমূহের জ্ঞান থাকা।

এখন আমরা উলামাদের মাঝে ইখলাফ হওয়ার কারণ বর্ণনা করব। ইজতিহাদের শর্ত নয়। যদিও এ দুটির মাঝে মজবুত একটি সম্পর্ক প্রমাণিত হয়েছে।
কিন্তু আমরা এ কিতাবে ইজতিহাদের বিস্তারিত বিবরণ না দিয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু বিষয় আলোচনা করেছি।
গ্রহণযোগ্য ইখতিলাফের বৈশিষ্ট্যগুলোর ক্ষেত্রে সকলে ঐক্যমতে পৌঁছে নি। সুতরাং ফিকাহের ক্ষেত্রে সেই মতানৈক্যগুলোর কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। যেমন: মুতাহ বিবাহের ক্ষেত্রে ইবনে আব্বাস রাযি: এর মতানৈক্য, দাসি থেকেও (ফিরাশ) বংশ হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতানৈক্য, মিনায় পরিপূর্ণ নামায আদায় করার ক্ষেত্রে হযরত উসমান রাযি: এর মতানৈক্য। এমনি আরো অনেক মতানৈক্য পাওয়া যাবে।
অগ্রহণযোগ্য মতানৈক্যের আলোচনা:
যে মতানৈক্য সংঘটিত হয় মুজতাহিদ এবং আম তথা সাধারণ মানুষের মাঝে।
আম মানুষের স্তর শুরু হয় মুকাল্লিদ থেকে। অর্থাৎ যে কোন মাযহাব বা মাযহাবের কোন আলেমের অনুসরণ করে। কিংবা মাযহাবের মুজতাহিদ হয়। সে এমন সাধারণ ব্যক্তির সাথে ইখতিলাফ করা যে ইলমে শরিয়্যাহ ও হাদিস চর্চা করে নি। কেবল মাত্র যুক্তিতর্কের উপর ভিত্তি করে নিজের মতামতকে ঠিকাতে ইখতিলাফ করা। আর এ ক্ষেত্রে এটিকে পেশ করা যে , দ্বীন হচ্ছে সহজতার নাম।

ইজতিহাদের ৪ টি স্তর উল্লেখ করে ইবনুল কাইয়িম রহ. তার রচিত ইলামুল মুয়াক্কিয়ীনে বলেছেন,
তারা হচ্ছে ঐসকল লোক যাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা উলামাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে ইজতিহাদে নেমে যায়। যাকে হাদিসের ভাষায় ফিতনাতুর রুয়াইবিযাহ বলা হয়েছে। যা মানুষের মাঝে এমনভাবে ছড়িয়ে যাবে যেভাবে শুকনা খড়িতে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّهَا سَتَأْتِي عَلَى النَّاسِ سِنُونَ خَدَّاعَةٌ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ

আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘মানুষের নিকট এমন ধোকাব্যঞ্জক যুগ আসবে, যাতে মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদীরূপে এবং সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদীরূপে পরিগণিত করা হবে। যখন খেয়ানতকারীকে আমানতদার মনে করা হবে এবং আমানতদার আমানতে খেয়ানত করবে। যখন জনসাধারণের ব্যাপারে তুচ্ছ লোক মুখ চালাবে।’’

তাখরীজ:: (আহমাদ ৭৯১২, ইবনে মাজাহ ৪০৩৬, হাকেম ৮৪৩৯, সহীহুল জামে’ ৩৬৫০)

অর্থাৎ যে বিষয়ের জ্ঞান নেই সে বিষয়ে ইজতিহাদ করে সমাধান দিতে চাইবে। নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করার জন্য। যেন লোকেরা তাবে অনেক বিজ্ঞ, বড় আলেম।
অথচ প্রকৃতপ্রক্ষে সে ইলমের বিষয়ে দরস, অধ্যয়ন কিংবা মোতায়ালা কিছুই করে নি।
বর্তমান জামানায় উলামাদের সাথে এমনটাই হচ্ছে।
যা নিজের মাঝে নেই তা বাড়িয়ে বলা যেন অন্যরা ধোঁকায় পড়ে।
ছহীহাইনে বর্ণিত একটি হাদিস থেকে জানা যায়, রাসূল (ﷺ) বললেনঃ যা তোমাকে দেয়া হয়নি, তা দেয়া হয়েছে বলা ঐরূপ প্রতারকের কাজ, যে প্রতারনার জন্য দু প্রস্থ মিথ্যার পোশাক পরল ।

সম্পূর্ণ হাদিসটি হল- সুলায়মান ইবনু হারব্ (র) এবং মুহাম্মাদ ইবনু মুসান্না (র) .... হযরত আসমা রাযি: থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন যে, কোন একজন মহিলা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার সতীন আছে । এখন তাঁকে রাগানোর জন্য যদি আমার স্বামী আমাকে যা দেয়নি তা বাড়িয়ে বলি, তাতে কি কোন দোষ আছে ? রাসূল (ﷺ) বললেনঃ যা তোমাকে দেয়া হয়নি, তা দেয়া হয়েছে বলা ঐরূপ প্রতারকের কাজ, যে প্রতারণার জন্য দু প্রস্থ মিথ্যার পোশাক পরল ।
তাহক্বীক:: মারফু হাদিস।

তাখরীজ :: [বুখারীঃ তা.পা ৫২১৯ ; মুসলিম ৩৭/৩৫, হাঃ ২১৩০, আহমাদ ২৬৯৮৭]

অন্য হাদিসে এসেছে,

من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة»

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি (সম্পদ,সম্মান) বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মিথ্যা দাবি করে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য স্বল্পতাই বৃদ্ধি করে দেন।

-সহিহ মুসলিম- কিতাবুল ঈমান

অগ্রহণযোগ্য ইখতিলাফের আরেকটি প্রকার!

এমনিভাবে, ইখতিলাফটি হবে মুজতাহিদ আলা মাযহাবিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ, এবং বাতিল মতবাদে বিশ্বাসী বেদয়াতীদের মাঝে।

আর এক্ষেত্রে জমহুর উসূবিদদের কথা বেদয়াতীদের কওল আক্বিদার ক্ষেত্রে কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না।

এমনিভাবে, যদি শরিয়াতে আহকাম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যদি সকলের ঐক্যমতে নির্ধারিত উসুলের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের বিরুধিতা করে, তাহলে শাখাগত মাসয়ালাতেও তাদের মতামত গ্রহণ করা হবে না।

উদাহরণস্বরুপ, জাহিরী মতামত উল্লেখ করা যেতে পারে। যাদের ইখতিলাফ গ্রহণযোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও শরয়ী দলিলের মতই গুরুত্ব দেওয়া।

আরেক প্রকার ইখতিলাফ সংঘটিত হয় উভয় পক্ষের দলীল প্রমাণ ছাড়া। যা কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না। অনেক সময় তা হয়ে থাকে গায়ের জোরে নিজের মনোবাসনাকে প্রমাণ করার জন্যে। কিংবা কোন শরয়ী হুকুমকে নিজের মন মত ব্যাখ্যা করার জন্যে। এ বিষয়টি সাধারণত মূর্খদের থেকেই বেশি হয়।

আমার এমন মুজতাহিদের পক্ষ থেকেই হতে পারে যার উপর নাফসানিয়্যাত প্রবল হয়ে গেছে ফলে সে শরিয়তের সহিহ হুকুম ছেড়ে দিয়েছে। আবার কখনো মুজতাহিদ শরিয়তের ছহিহ দলীল থেকে বিপদগামী হয়ে যাওয়া ফলে হয়ে থাকে।

মোটকথা, অগ্রহণযোগ্য ইখতিলাফের ক্ষেত্রে বলা যায়, যাতে গ্রহণযোগ্য ইখতিলাফের পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না।

গ্রহণযোগ্য ইখতিলাফের কারণ সমূহ আগামী পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

মূল -লেখক ড. তারিক আব্দুল হালিম

৫ ই জমাদুস সানী

মার্চ,২৯-২০১৯